আলাপচারিতায় কবি শৈলেশ্বর ঘোষ

সম্পাদনা
সব্যসাচী সেন

লিইবার ফিয়েরা

সম্পাদকীয়

ক্ষতিকর কবি শৈলেশ্বর ঘোষ

যে কোনো কবি-লেখকের সাক্ষাৎকার ধরে রাখে সময়ের ইতিহাস। এইসব কথাবার্তা থেকে তাদের মন-মানসিকতার একটা পরিচয় আমরা পেতে পারি... আলাপচারিতায় বেরিয়ে আসে মানুষটার মেরুদণ্ড ঠিক কতটা দৃঢ়!

পরিবর্তন জীবনের ধর্ম... সময়ের সঙ্গে মানুষেরও মনের পরিবর্তন হতে থাকে... যে মানুষটা ১৯৭৯ সালে কবি অরুণ বণিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে একটু তির্যক ভঙ্গিতে জীবনানন্দ ও মানিক সম্পর্কে কিছু কথা বলেছিলেন। ২০১১ সালে এসে সেই মানুষটাই আবার 'মল্লার' পত্রিকার সম্পাদক শুভময় সরকার যখন প্রশ্ন করেছেন তাঁর প্রিয় কবি-লেখক কারা... নির্দ্বিধায় উত্তর দিয়েছেন... প্রিয় লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রিয় কবি জীবনানন্দ দাশ... ১৯৭৯... তখনও তিনি জীবনানন্দকে নিয়ে একটিও প্রবন্ধ লেখেননি... পরবর্তীতে তিনি একটি প্রবন্ধে জীবনানন্দকে বলেছিলেন ক্ষতিকর কবি... আমি বলি, বাংলাভাষায় তিনিই সবচেয়ে 'ক্ষতিকর কবি'... মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ বিনষ্টকারী ভাইরাস... তাঁর কবিতা মহাজাগতিক বিস্ময়... তাঁর কবিতার যে কোনো আলোচনাই অসম্পূর্ণ... তাঁর হাতে কলমের বদলে ছিল খতরনাক কালাশনিকভ...

সাধারণ ভাবে মানুষটাকে দেখে মনে হত শান্ত ধীর স্থির... কিন্তু তাঁর ভেতরে একজন সব সময় এক ভয়ংকর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে থাকত... সেটা অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় নিজেকে যখন ধীরে ধীরে মেলে ধরতেন... তখনই বোঝা যেত... তিনি ভয়ংকর স্পষ্টবাদী ও তীব্র আক্রমণকারী... তিনিই তো বলেছিলেন, কবি শব্দটি বিদ্রোহবাচক... সাফল্য শব্দটিই তাঁর কাছে সবচেয়ে অশ্লীল... সাফল্য শব্দটিকে তিনি সব সময় ঘৃণা করতেন... তিনি কখনও 'সফলতার শকুন' হতে চাননি... যখন কবি-গদ্যকার ও প্রাবন্ধিক অর্ণব সাহা তাঁর সম্পর্কে বলেন 'শৈলেশ্বরের মতো নিখাদ রেবেল যে-কোনো সাহিত্যেরই সম্পদ' তখন আমরা অর্ণবের সঙ্গে একমত না-হয়ে পারি না। তিনি অলআউট ক্ষমতার বিরোধিতা করেছেন... হাংরিকে তিনি দেখেছেন এভাবে: আধুনিকতার শবদেহের উপর উল্লাসময় নৃত্য... হাংরিকে নিয়ে তিনি কখনও মজা করেননি...

তাঁর সঙ্গে কত কত কথা... কত ব্যক্তিগত কথা ভাগ করে নিয়েছি... সাহিত্য নিয়ে কত আলোচনা... তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতায় শিখেছি... সমৃদ্ধ হয়েছি... সবচেয়ে বড়ো কথা অন্তরঙ্গ আলাপচারিতার সময় লক্ষ করেছি... মানুষটা অন্যের মতকে সম্মান জানাতেন... অন্যের মত মনোযোগ দিয়ে শুনতেন... অন্যকে বলতে দিতেন... যে কোনো বিষয়ে অনায়াসে তাঁর সঙ্গে তর্ক করা যেত... ভীষণ নাকউঁচু মানুষ ছিলেন। সহজে কারো প্রশংসা করতেন না।

ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় আমাকে একবার বলেছিলেন— 'দ্যাখো, কাউকে যদি মিষ্টি করে একটু মিথ্যে করে বলি তুমি ভালো লিখেছো... তাহলে আমার ভক্তবৃন্দের অভাব হবে না। কিন্তু আমার ভক্তবৃন্দের দরকার নাই। আমি একা থাকতে চাই... আমি লুকিয়ে থাকতে চাই... কবিরা তো আর রাজনৈতিক নেতা নয়... যে মঞ্চে উঠে ভাষণবাজি করবে... কবিরা এত কথা বলে কেন? কবিরা নির্জনে নিভৃতে থাকবে... কবিতা চর্চা করবে...' যা বলবে তার কবিতায়... তার লেখালেখিতে... তার মানে আমি বলতে চাই না যে কবি-লেখকেরা রাজনীতি সচেতন হবেন না।'

একা হয়ে গেছেন... তবুও তিনি আপস করেননি... ঘরে-বাইরে আক্রান্ত হয়েছেন... তাঁর পরিবারের মানুষ-জন তাঁর লেখালেখিগুলোকে পছন্দ করেননি... তাঁর এক সময়ের বন্ধু-বান্ধব দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন... সব সময় তিনি চুপ করে থাকেননি... রক্তমাংসের মানুষ তো... তাঁরও অভিমান হয়... তাঁরও রাগ হয়... রাগ একসময় ক্রোধে পরিণত হয়... তাই কখনও কখনও ফুঁসে উঠেছেন... সত্যের পথে থেকেই পালটা আক্রমণ করেছেন তাঁর শানিত তীক্ষ্ণ বোধ ও চেতনা দ্বারা...

যারা হাংরি ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা বা গবেষণা করছেন তাদের এই গ্রন্থ কাজে লাগবে বলেই মনে করি... কারণ এইসব আলাপচারিতায় উঠে এসেছে বহু অজানা তথ্য...

আমরা যে-কটা সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করতে পেরেছি... সেগুলোই এখানে থাকল... এর বাইরে হয়তো কোনো সাক্ষাৎকার থেকে যেতে পারে... যার হদিস আমরা পাইনি... হয়তো কোনো অনুরাগী কোনো পাঠকের কাছে থাকতে পারে... তারা যদি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমাদের পাঠিয়ে দেন... পরবর্তীতে সেগুলো অবশ্যই সংযোজিত হবে এই গ্রন্থে... আমরা তাঁর সেই অনুরাগী পাঠকের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

সব্যসাচী সেন

১০ ই মাঘ, ১৪২৫
ইং ২৫ জানুয়ারি, ২০১৯

সূ চি

মুখোমুখি কবি শৈলেশ্বরের সঙ্গে অরুণেশ ঘোষ	১১
মুখোমুখি কবি শৈলেশ্বরের সঙ্গে অরুণ বণিক	২১
মুখোমুখি কবি শৈলেশ্বরের সঙ্গে সূর্য মুখোপাধ্যায়	৪৩
মুখোমুখি কবি শৈলেশ্বরের সঙ্গে অর্ণব সাহা	৭৩
মুখোমুখি কবি শৈলেশ্বরের সঙ্গে মল্লার পত্রিকা	৯১
মুখোমুখি কবি শৈলেশ্বরের সঙ্গে সব্যসাচী সেন	১২১
মুখোমুখি কবি শৈলেশ্বরের সঙ্গে কৃশানু বসু	১৫১
মুখোমুখি কবি শৈলেশ্বরের সঙ্গে স্নিগ্ধেন্দু ভট্টাচার্য	১৭৩
মুখোমুখি কবি শৈলেশ্বরের সঙ্গে সোমা ভট্টাচার্য	১৮৭
কবি শৈলেশ্বর ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি	১৯৮

...ক্ষুধার্ত আন্দোলন শুধু কলকাতায় সীমাবদ্ধ না থেকে পশ্চিম বাংলায় মফসলেও ছড়িয়ে পড়েছে...

মুখোমুখি কবির সঙ্গে
অরুণেশ ঘোষ

'জিরাফ' পত্রিকা।
সংকলন-১০। জানুয়ারি, ১৯৮৫।
সম্পাদক: অরুণেশ ঘোষ।
সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন কবি অরুণেশ ঘোষ।

অরুণেশ: মলয় রায়চৌধুরী কি হাংরি জেনারেশনের প্রতিষ্ঠাতা? নাকি কোনো ব্যক্তিই নয় প্রতিষ্ঠাতা— এই আন্দোলন কি গড়ে উঠেছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে?

শৈলেশ্বর: কোন হাংরি জেনারেশনের? শক্তির হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টা ছিল শক্তি, মলয়ের হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টা মলয়, আমার হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টা আমি, প্রদীপের প্রদীপ, বাসুদেবের বাসুদেব— এইরকম এক-একজনের কাছে হাংরি আইডিয়া এক-একরকম— আর সব মিলিয়ে যে ব্যাপারটা ঘটেছে সেটাই একটা আন্দোলন, কারও একক চিন্তাতে এটা সম্ভব হয়নি, সম্ভব ছিলও না। তবে বিনয়ের কবিতা আলোচনা করতে গিয়ে শক্তি 'হাংরি জেনারেশন' কথাগুলি প্রথম লিখেছিল। শক্তির 'হাংরি জেনারেশন' বন্ধ হয়ে যায় ১৯৬৩-তেই। মলয় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল পাটনাতেই। এদিকে আমার 'তিনবিধবা' শীর্ষক কবিতা নিয়ে যে গোলমাল হয়, তারপরই প্রদীপ, সুবো, বাসুদেব, সুভাষ ও আমার মধ্যে গড়ে ওঠে একটা আত্মবন্ধন— বছর খানেক ধরে চলতে থাকে আমাদের নানা ধরনের ক্রিয়াকলাপ ও লেখালেখি নিয়ে উত্তেজনা— যেহেতু মৃত ওই হাংরি জেনারেশনে আমরা দু-একজন এক-আধবার লেখাটেখা দিয়েছিলাম, তাই এ নামটাই আমরা ব্যবহার করি— একটা সংকলন বের করার পরিকল্পনা করা হয়, মলয়কে নেয়া হয় তাতে— যে সংকলন নিয়ে পুলিশি হামলা, এইসব ব্যাপার ঘটল সেসব তো আপনার জানেনই। একটা কথা এখানে বলা দরকার যে প্রদীপ, সুবো, বাসুদেব, সুভাষ ও আমার— এই যে সম্পর্ক তা অনেকটাই প্রাকৃতিক। যে হাংরি জেনারেশনকে আজ সকলে জানে তার স্রষ্টা মূলত এই পাঁচজন। আমরা আমাদের চিন্তা আর রচনা দিয়ে শক্তি মলয়ের মৃত হাংরি জেনারেশনকে সক্রিয় করে তুলি। ইংরেজিতে লেখা মলয়ের কয়েকটি ম্যানিফেস্টো— যার অপরিণত ও কখনও হাস্যকর কথাবার্তা আমাদের কাছে আদৌ গুরুত্ব পায়নি।

অরুণেশ: মলয় সরে গেলেন কেন? বন্ধুদের ওপর রাগ করে নাকি অন্য কোনো কারণে? যে সময়টায় মলয় ক্ষুধার্তদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন,

তখনকার ইতিহাস জানতে আমরা আগ্রহী।

শৈলেশ্বর: একজন নন-ক্রিয়েটিভ ম্যানেজার (ব্যাংকের নয়) কতদিন পারে তুমুল সৃষ্টিশীল উথালপাতালের মধ্যে থাকতে? প্রচারের লালসা— দেশ বিদেশের হইচই-টা কমে যাবার আগেই নিজের আখের গুছিয়ে নাও— এই মানসিকতা সহ্য করা সম্ভব ছিল না আমাদের। লোভে ওর জিভ্ দিয়ে জল পড়তে শুরু করেছিল— শেষপর্যন্ত আমাদের নামে ও নিজেই প্রবন্ধ লিখতে শুরু করল। প্রবন্ধের বিষয় 'মলয় রায়চৌধুরী' : জীবিত বাংগালী মহাকবি। ভাবুন! ও ভেবেছিল ওর লম্ফঝম্ফ আর বাকতাল্লাতেই মানুষ ওকে নিয়ে নাচানাচি শুরু করবে। ওর দাদাকে ও জীবনানন্দ দাশের পর বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি বানিয়ে ফেলেছিল। আর একটুও দেরি না করে, পাছে অন্য কেউ আবার রায়চৌধুরী ভ্রাতৃযুগলকে ডিঙিয়ে মহাকবি হয়ে যায়। এসবের নমুনা আপনি Salted feather : Hungry issue-তে মলয়ের লেখা 'The literary situation in Calcutta' শীর্ষক সেই অসাধারণ (!) গদ্যটিতে পেয়ে যাবেন। লেখক হতে গেলে তো পায়ের নীচে একটু-আধটু শক্ত জমি দরকার! একজন আলোচক মন্তব্য করে বসেছে যে আমার নামে রাখা পুলিশের স্টেটমেন্টই নাকি মলয়ের মধ্যে এই বৈরাগ্য এনেছিল। হাঃ বৈরাগ্য! ১৯৬৭-র পরেই তাঁর এই বৈরাগ্য দেখা দেয়। Salted feathers-এ তার প্রবন্ধ City lights পত্রিকার একটি সংখ্যায় হাংরি জেনারেশনের ইতিহাস রচনা, Klacto কাগজে আমাদের নাম ভাঙিয়ে ওর নিজের সম্পর্কে লেখা ওর প্রবন্ধ— পরপর এগুলো আমাদের নজরে আসে এবং ওর এইসব কদর্য কার্যকলাপের বিরোধিতা করি আমরা। মলয় সম্পাদিত 'হাংরি জেনারেশন নং ৯৯'-এ আমাদের যেসব চিঠিপত্র মলয় ছেপেছিল তাতেই সমস্ত ব্যাপার বুঝতে পারবেন।

বন্ধুদের উপর রাগ। উরেব্বাবা, সে কি কম রাগ না কি! 'ইনজিরি'তে টাইপ করা সব গালাগাল পাঠাত আমাদের কাছে। দেশ-বিদেশে ওকে মহাকবি হতে দিল না ওর বন্ধুরা।

অরুণেশ: শুরু থেকে আজ অবধি মলয়ের ভূমিকা সম্পর্কে আপনার কী মনে হয়? আর তার মৌলিক লেখালেখি, বিশেষ করে কবিতা সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

শৈলেশ্বর: ভূমিকা? হ্যাঁ সিংহচর্মাবৃত গর্দভের। ভঙ্গিটা ছিল খুব তেজি-তেজি,

কিন্তু কবিতা বলে যা চালালো তাতেই আসল আওয়াজটা বের হয়ে পড়ে। কবিতা সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণাই ছিল না ওর। কবিতা জীবনের বিপরীতে নয়, কবিতা আছে জীবনের অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে— অসৎ বস্তুপৃথিবী সেই কেন্দ্রটিকে রাহুগ্রস্ত করে রেখেছে, সেখান থেকে সত্যকে উদ্ধার করতে পারে যে— সেই কবি। মলয় পারেনি। কিছু হাত-পা ছুড়েই ও শেষ হয়ে গেছে। বস্তুপৃথিবীর সংঘর্ষে সৃষ্ট তাৎক্ষণিক কিছু প্রতিক্রিয়াকে কবিতা বলে আমি মনে করি না। জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছাবার পথের অভিজ্ঞতাই থাকবে কবিতায়। ওর কবিতার ভাষাটাই ছিল হাস্যকর। কৃত্রিম। কারণ তা ভিতর থেকে আসা নয়— তৈরি করা। 'সচেতন বিহ্বলতা' কথাটি আসলে সোনার পাথরবাটি। যদি কেউ বিহ্বল হয়ে পড়ে, আবার সচেতনও থাকে যে সে বিহ্বল হয়েছে তবে সেটা নির্ঘাৎ ভণ্ডামি। পাগল যদি বোঝে সে পাগল তবে তার অসুখ সেরে যায়, না হলে সে পাজি! এইসব কথাবার্তাই কৃত্রিম রচনার ভিত্তিভূমি। মলয়ের রচনায় এই জন্যই— false notes-এ পরিপূর্ণ!

পুরনো সেসব কথা তো আছেই, দেখ, দেখ, শৈলেশ্বর আমার বিরুদ্ধে কি সব বলছে, এখন আবার নতুন যোগ হয়েছে— দেখ, দেখ, সন্দীপন আমাদের লেপ সিগারেটে ফুটো করে দিয়েছিল। বুঝুন ঠ্যালা!

অরুণেশ: মলয়ের প্রত্যাবর্তন, আর শুধু ক্ষুধার্ত ৭ম সংকলনে আপনার বই-এর আলোচনা দিয়ে, তারপরেই তার আক্রমণ প্রতিষ্ঠানকে নয়, তার পুরানো দু-একজন সহযাত্রীর ওপর... এটাকে কীভাবে নিচ্ছেন?

শৈলেশ্বর: যার রচনা false notes-এ পূর্ণ তার পক্ষে তো এটাই মানানসই কাজ। ব্যাপারটা রীতিমতো উপভোগ্য।

অরুণেশ: হারাধন ধাড়ার (দেবী রায়ের) কাছে আপনার সম্পর্কে ১০টি অভিযোগ— ওই অভিযাগগুলির উৎস কী বলে মনে হয়? আপনার প্রতিক্রিয়াই বা কী?

শৈলেশ্বর: উৎস হল ফাতরামি। মলয় আর হারাধন এরা আবার যুগলে বন্দি তো! প্রতিক্রিয়া? গত ১৭ বছর ধরেই তো ওরা এসব চালিয়ে যাচ্ছে, আমার কী ছিঁড়েছে তাতে?

তবে হ্যাঁ, একটা কথা ওরা লিখেছে যে আমি যাদব-সন্তান। এটাই একমাত্র সত্যি। আমার জন্ম-উৎস মলয় সমর্থিত বর্ণ-ব্যবস্থার একেবারে নীচে। এজন্য আমার বিন্দুমাত্র লজ্জা বা কুণ্ঠা নাই, বরং গর্ব আছে।

সমাজের নীচু তলায় জন্মাবার ফলেই আমি সৃষ্টিশীল, আমি লিখতে পেরেছি এবং লিখছি— আর ও, ফোঁপরা— আমি পজিটিভ আর ও নেগেটিভ।

আর হারাধন ধাড়া তো নিজের নামের লজ্জা ঢাকার জন্য একেবারে পুলিশের নাম নিয়ে নিয়েছে।

অরুণেশ: পুলিশের কাছে দেওয়া আপনার বিবৃতি যা এখন দু-একটি পত্র-পত্রিকায় বেরিয়েছে, তা কি সত্য? যদি সত্যি হয়, এরকম বিবৃতি দিলেন কেন? যদি সত্যি না হয়, এই বিবৃতি প্রচার করার উদ্দেশ্য কী বলে মনে হয়?

শৈলেশ্বর: পুলিশের কাছে দেওয়া মানে? পুলিশ তো ওই 'তিন বিধবা' বেরোবার পর থেকেই আমার পেছনে লেগে ছিল। গ্রেপ্তার হওয়ার আগেও আমাকে লালবাজারে ডাকা হয়েছিল ওই কবিতার জন্য। 'হাংরি জেনারেশন সংকলন' বের হলে পুলিশ আবার আসে আমাদের ঘরে এবং এই সংকলন নিয়ে কী গোলমাল হতে পারে বলে, আরও বলে— কারা কারা পুলিশের হস্তক্ষেপ করার জন্য চাপ দিচ্ছে তাদের কথা। শেষপর্যন্ত চাপের মুখে পড়ে পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতেই হয়। ২রা সেপ্টেম্বর পুলিশ ঘুম থেকে তুলে গ্রেপ্তার করে আমাকে ও সুভাষকে। লালবাজারে দফায় দফায় চলে জিজ্ঞাসাবাদ প্রায় ৮/৯ ঘণ্টা।

১৯৬৩-তেই মলয় হাংরি জেনারেশন করার জন্য পুলিশের কাছে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখেছিল। লালবাজারে আমি সেটা দেখি। মলয় সম্পাদিত 'হাংরি জেনারেশন ৯৯'-এর চিঠিপত্রগুলো দেখুন। পুলিশ আমার নামে কী স্টেটমেন্ট লিখে রেখেছে। তার কোনো দায়িত্বই আমার নয়। পুলিশ না চাইতেই যারা লালবাজারে গিয়ে স্টেটমেন্ট দিয়ে এসেছিল, মলয় এবং তার সাঙাতরা। আমার নামে রাখা পুলিশের স্টেটমেন্টকে ওদের স্টেটমেন্ট-এর সঙ্গে এক করে গত ১৮ বছর ধরেই জনে জনে বিলি করছে। উদ্দেশ্য একটাই, 'দেখ দেখ, এই হল শৈলেশ্বর ঘোষ, তোমরা আবার এরই কবিতা পড়ো, ছিঃ!'

কোর্টে আমি যা বলেছি কেবল তারই দায়িত্ব আমার। আর কোর্টে তো অনেক ভালো ভালো কথা বলে ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছি। পুলিশ তো আমাকে মলয়ের বিপক্ষের সাক্ষী সাজিয়েছিল, কিন্তু আমি কোর্টে যা বললাম, ওরা সেটা কেন বিলি করে না। একজন ব্যর্থ

লেখকের আক্রোশ কী কম!

এ প্রসঙ্গে আর একটু বলি। পুলিশের ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে কারওরই স্বস্তি ছিল না। প্রদীপ তো গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য বেশ কিছুদিন ত্রিপুরার বাইরে ছিল। মামলা প্রায় শেষ হবার মুখে প্রদীপ ধরা দেয়। তখন পুলিশ-ভীতি তার অনেকটা দূর হয়ে গেছে। অথচ প্রদীপের ব্যাপারটা আমাদের কাছে খুব স্বাভাবিক মনে হয়েছে। একজন লেখক বা কবির প্রকৃত সাহস তো জীবনের মুখোমুখি হবার ক্ষেত্রে। মামলা চলার সময় প্রত্যেকেরই একটাই চেষ্টা ছিল যে কী করে এর থেকে রেহাই পাওয়া যায়। কারণ তখনও আমাদের মধ্যে অনেকেই বুঝতে পারেনি যে জেলখানা বাইরের পৃথিবীর চেয়ে খারাপ জায়গা নয়। মলয়ের দাদা সমীর রায়চৌধুরীর উদ্যোগে আমাদের ঘরে বসেই রচিত হয়েছিল একটা স্টেটমেন্ট, যেটা পুলিশের কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল কি না, আজ আর স্মরণ করতে পারছি না। উদ্দেশ্য ছিল, ওই স্টেটমেন্টের ভিত্তিতে পুলিশ মামলা তুলে নেবে। দিল্লী থেকে পুলিশের উপর চাপ আসছিল মামলা তুলে নেবার জন্য সে-সময়। পুলিশ অবশ্য শেষ পর্যন্ত জানায়, যে কোনো একজনের বিরুদ্ধে তারা মামলা রাখবে, না হলে সারা দেশের সারা দেশের সামেনে পুলিশ অপদস্থ হবে।

অরুণেশ: এখন এরকম একটা ধারণা ছড়িয়ে পড়েছে যে আপনি ক্ষুধার্ত লেখক হয়েও ক্ষুধা-আদর্শে বিশ্বাস রাখতে পারেননি। সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করেছেন গোড়া থেকেই— আপনার বক্তব্য কী?

শৈলেশ্বর: এটা কি একটা নতুন প্রচার তরঙ্গ নাকি? ক্ষুধার্ত আদর্শ বলে কিছু নেই। আছে চেতনা— যার অনেকটা আমিই সৃষ্টিই করেছি। সুতরাং নিজের চেতনা থেকে বেরিয়ে যাব কোথায় নিশ্চেতনায়? নিজের চেতনা থেকে সরে যাওয়ার অর্থ Disintegrated হয়ে যাওয়া— আর যে লোক নিজের খণ্ড অস্তিত্বগুলি চেতনা দিয়ে সমগ্ররূপ দিতে পারে না, সে সৃষ্টিশীল থাকে কী করে? আমি নিজের চেতনার কাছে সৎ হয়েই আছি। এমন হতে পারে যে একটা গ্রন্থে নিজের যে অবস্থাটা প্রকাশ করলাম, কেউ তা থেকে ধরে নিল এটাই গ্রন্থকারের প্রকৃত অবস্থা— কিন্তু আমি যখন পর্দাগুলো সরাতে থাকি, পরের একটি গ্রন্থে সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখি, তখন সেই পাঠক আর সেটা ধরতে পারে না। ভবিষ্যতেও আমি যা লিখব তা হবে ক্ষুধার্ত চেতনার আরও সম্প্রসারণ।

অরুণেশ: ক্ষুধার্ত আন্দোলনে নেগেটিভ ও পজিটিভ দু'ধরনের শক্তি মিলেমিশে ছিল কি? ওই আন্দোলনের কোন দিকটা আপনাকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করেছে?

শৈলেশ্বর: ছিল। হারাধন, মলয় এরাই ছিল নেগেটিভ ফোর্স। পজিটিভ ফোর্স আমরা যাঁরা নিজেদের ক্ষমতা দিয়ে এই আন্দোলনকে ১৯৮৫ সালে নিয়ে এসেছি। পরাক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে লড়ে নতুন এই সাহিত্যকে শক্ত জমির ওপর দাঁড় করিয়েছি আমরাই। পজিটিভ না হলে ২০ বছর ধরে এত বড়ো চাপ ও বাধার মুখে দাঁড়িয়ে এত নতুন পাঠক আমরা সৃষ্টি করলাম কীভাবে? ওরা অন্তঃসারশূন্য ও নেগেটিভ বলেই এই প্রবল স্রোতের তোড়ে ওরা লুকনো কাঠের মতো ভেসে গেছে।

আমরা যখন এই আন্দোলন শুরু করি সেই মুহূর্তে এর কোনো দিকই ছিল না। দিকটা ঠিক করেছি ধীরে ধীরে আমি ও আমার কয়েকজন বন্ধু। আমি এর দিক ও চরিত্র ঠিক করতে কতটা কী করেছি সচেতন পাঠক যাঁরা, তাঁরা জানেন। 'প্রতিবাদের সাহিত্য'— গ্রন্থটি তো আপনিও পড়ে থাকবেন। আর অনুপ্রেরণা? আমি নিজেই যখন এর তত্ত্ব ও চেতনাকে বেশ কিছু পরিমাণে নির্দিষ্ট করে দিয়েছি তখন আমি ছাড়া আমাকে আর কে অনুপ্রেরণা দেবে! আমার প্রেরণার উৎস সব সময়েই আমি। 'আমিই আমার বিষয়'— একথা তো আমিই বলেছি।

অরুণেশ: মাঝখানে ক্ষুধার্ত আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যায় কেন? আবার কীভাবে তার শুরু হল?

শৈলেশ্বর: ১৯৭৫-এ ৩ নং ক্ষুধার্ত সংকলন বেরোবার পর এরকম একটা অবস্থা এসেছিল। লেখালেখির ব্যাপারে প্রায় সকলেই থম্‌কে গিয়েছিলাম আমরা। গোটা সত্তর দশক রাজনৈতিক আন্দোলনে মথিত হয়েছিল— সেই সময়ের ভয়ংকর অভিজ্ঞতাগুলি আমাদের চেতনাতে প্রবল অভিঘাত সৃষ্টি করে— লেখালেখির দিকে একটা নতুন স্তর বিন্যাসের প্রয়োজন হয়— প্রায় ১৯৮০ সাল পর্যন্ত চলে এই অবস্থা। এই সময়ের মধ্যে আমি কয়েকটি ছোটো আকারের 'ক্ষুধার্ত' সংকলন ও ত্রিপুরায় প্রদীপ চৌধুরী কয়েকটি 'স্বকাল' বের করে চেতনা-স্রোতকে ধরে রাখার চেষ্টা করি। আবার নতুন লেখালেখি শুরু হয় সবারই। এই সময় প্রদীপ চলে আসে কলকাতায় উত্তরবঙ্গে অরুণেশ ঘোষ সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং অনেক নতুন কবি-লেখক যোগ দেয় এই